16-2-51

ঘোষনা

(৩০শে জানুয়ারী, ১৯৫০)

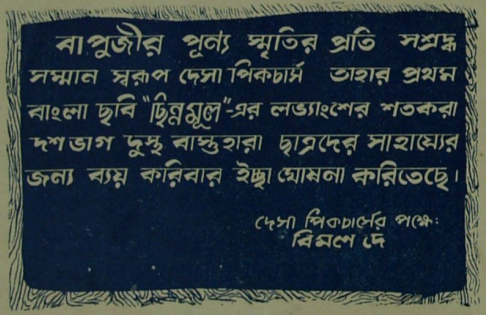

ছিন্নমূল

গ ল্পা ং শ

পূর্ব্ববঙ্গের একখানি ছোট গ্রাম। নলডাঙার দক্ষিণ দিকের প্রকাণ্ড মাঠটা পার হলেই অদূরে চির-বিদ্রোহী পদ্মা।

গাঁয়ের লোক-সংখ্যা বিগত দুর্ভিক্ষে প্রায় অর্দ্ধেকে নেমে এসেছে। গ্রাম-বাসীদের বেশীর ভাগই হচ্ছে কামার, কুমোর, ছুতোর, গোয়ালা প্রভৃতি জাত-বৃত্তিজীবী শ্রেণীর লোক। মহাযুদ্ধ, মন্বন্তর, মহামারী—ঢেউ-এর পর ঢেউ-এর মতো এত ঝড়ঝাপটার মধ্যেও নলডাঙার এই উদয়াস্ত খেটে-খাওয়া লোকগুলি কাবু হয়েও হার মানে নি—এরা ভাঙ্গে, তবু মচকায় না।

শ্রীকান্ত মণ্ডল বয়সে অনেকের চেয়ে ঢের ছোট হলেও স্বভাব-গুণে সারা গাঁয়ের মোড়ল হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাট বিক্রীর পরামর্শ থেকে মামলামোকদ্দমার তদ্বির পর্য্যন্ত শ্রীকান্তর ডাক পড়ে সব কাজে।

শ্রীকান্ত সম্প্রতি বিয়ে করেছে। তার নববিবাহিতা পত্নী বাতাসীকে নিয়ে এই ঘোর আর্থিক সঙ্কটের দিনেও সে যখন এক সুখের নীড় বাঁধায় হাত দিয়েছে, ঠিক সেই সময়ে দেশের উপর দিয়ে বয়ে গেল এক প্রচণ্ড রাজনৈতিক ঝড়। অখণ্ড বাংলা হল দ্বিখণ্ডিত। গুজবে আর আতঙ্কে পার্শ্ববর্ত্তী হিন্দু প্রধান পলাশ-ডাঙা ও তালপুকুরের বার আনাই সাফ হয়ে গেল। কাছেপিঠের আরো কয়েকটি গ্রামেও ভাঙ্গন লেগেছে। বাস্তুভিটা ত্যাগের এই হিড়িকের ঢেউ শেষকালে নলডাঙায়ও পৌছে গেল।

গ্রামের দুই দুষ্টগ্রহ মধু গাঙ্গুলী ও মোজাফ্‌ফর খাঁ। আকালের বছরে দুজনে মিলে বহু নিঃস্ব চাষীর জোতজমি কুক্ষিগত করেছে। দেশ বিভাগ তাদের আবার এক দাঁও মারার পথ খুলে দিল। তাদের অপকর্ম্মে যে লোকটি পদেপদে প্রবল প্রতিবন্ধক হতে পারত, সারা গাঁয়ের প্রিয়পাত্র সেই শ্রীকান্তকে এক মিথ্যা মামলায় জড়িত করে তারা ইতিমধ্যে জেলে পাঠিয়েছে।

মধু গাঙ্গুলী নলডাঙার হিন্দুদের গ্রাম ছাড়ার জন্যে উস্কানি দিতে থাকে। একদিকে পাকিস্তানে পড়ে থাকার অনিবার্য্য ভাবী বিপদের কথা শোনায়; আর এক দিকে শোনায়, একবার কলকাতা গিয়ে পৌছতে পারলে আর ভাবনা কী—হিন্দুস্থানের গভর্ণমেণ্টের কল্যাণে থাকা-খাওয়া ও জমিজায়গার পাকা ব্যবস্থা তারা তৈরী দেখতে পাবে। হরকান্ত, হারান ঢালি, ধুনকর কৈলাস, সিধু কামার, স্বর্ণকার মনোমোহন ও আরো অনেকে বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর কাছে পরামর্শ নিতে যায়। প্রথমটায় বিশু চক্কোত্তি তাদের অকারণে আতঙ্কিত হতে বারণ করলেন।

কিন্তু মধু গাঙ্গুলি ও মোজাফ্‌ফর খাঁর কারসাজিতে গুজবের মাত্রা এত বেশী চড়ে গেল যে, নলডাঙা অবশেষে চঞ্চল হয়ে উঠল। বিশু চক্কোত্তিও ভয় পেয়ে গেলেন।

সুরু হল বাস্তত্যাগের উদ্যোগ-আয়োজন। কলকাতায় যাবে টাকা কোথায়? যে যার ঘরদোর বিক্রি করে দিল। একমাত্র বাতাসীই তার স্বামীর অবর্ত্তমানে শ্বশুরের ভিটা বেচে ফেলতে রাজী হল না। মধু গাঙ্গুলী নানাভাবে চেষ্টা করেও তাকে টলাতে পারল না। গ্রামত্যাগীদের বাড়ীঘরদোর সব জলের দরে চলে গেল মধু গাঙ্গুলী আর মোজফ্‌ফর খাঁর হাতে।

একদিন নলডাঙার জন বিশ-বাইশ শিশু, বৃদ্ধ নারী ও পুরুষ চোখের জলে বুক ভাসিয়ে পিতৃ-পিতামহের বসতবাটীর মায়া কাটিয়ে যাত্রা করল রাজধানী কলিকাতার অভিমুখে।

পথে ষ্টীমার ও ট্রেণের অসম্ভব ভীড়ে অকথ্য দুর্ভোগ সহ্য করে নলডাঙার দল কলকাতা এসে পৌছল। শিয়ালদহ সাউথ ষ্টেশনের অস্থায়ী আশ্রয়-প্রার্থী শিবিরের অবস্থা দেখেই তো নলডাঙার দলের চক্ষু স্থির। ছোট্ট একফালি জমির মতো পরিসরের মধ্যে বহু পরিবার ঠাসাঠাসি করে আছে। স্থান নেই আর, তবু নাকি ওরই মধ্যে দেখে শুনে বলে বুঝিয়ে জায়গা করে নিতে হবে।

দলের নেতা বিশু চক্কোত্তির নির্দ্দেশে এবং প্রসন্ন ঘোষের পরিচালনায় সবলে মিলে ওরই মধ্যে এক কোণে কোনো মতে পড়ে থাকার মতো জায়গা করে নিল। এদের সব চেয়ে ভাবনা সন্তানসম্ভবা বাতাসীকে নিয়ে। দু'চার দিনের মধ্যে মাথা গোঁজার আস্তানা একটা যোগাড় না করলেই নয়। কিন্তু দু'চার দিন দূরে থাক, দু'চার মাসের মধ্যেও যে বাসস্থানের একটা ব্যবস্থা হবে এমন ভরসা তারা দেখছে না। নলডাঙার বহু আগে থেকে যারা এসেছে এমন বহু পরিবার নিরুপায় হয়ে আজও ষ্টেশন প্লাটফর্ম্মের বেআব্রু সংসারযাত্রায় আটকে পড়ে আছে। প্রসন্ন, কৈলাস, হারান, সিধু সকলেই ভবিষ্যৎ ভেবে শঙ্কিত হয়ে

ওঠে। নিস্তারিণী, মঙ্গলা ও বাতাসী হাঁপিয়ে উঠেছে এই অসম্ভব অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে।

কিন্তু নিরাশ হয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না। বিশু চক্কোত্তি মাঝে-মাঝে দলবলকে আশাভরসার কথা শুনিয়ে চাঙ্গা করে তুলতে চান। সকালে উঠে এক দল যায় বাড়ী খুঁজতে, এক দল যায় চাকুরীর সন্ধানে। পনের ষোল দিন কেটে গেল। না হল কারো চাকুরি, না পেল একটা খড়ের চালার মেটে খুপরি।

নলডাঙা ধৈর্য্য হারায়। মনে মনে অনেকেই এখন দেশে ফিরে যেতে চায়। মতলববাজ মধু গাঙ্গুলী নিশ্চিত সুযোগ সুবিধার এক মিথ্যা ছবি তুলে ধরেছিল তাদের সামনে। হারানের পঁচাত্তর বছরের বুড়ি-মা তো দেশে ফিরে যাবার জন্যে প্রায়ই কান্নাকাটি করে। বাতাসীরও মন পড়ে আছে নলডাঙার মাটিতে। স্বামী তার পাকিস্তানে—জেলে।

কয়েক সপ্তাহ চূড়ান্ত দুঃখভোগের পর নলডাঙার দল এবং আরও কয়েকটি উদ্বাস্তু পরিবার একটা মস্ত বড় খালি বাড়ীতে গিয়ে বাড়ীওয়ালার অনুমতি না নিয়েই সংসার পাতিয়ে বসল। বাড়ীওয়ালা প্রথমে দারোয়ান দিয়ে শাসায়, তারপর আদালতের ভয় দেখায়, অবশেষে ভাড়াটে গুণ্ডাদল এনে মেরে তাড়াবার মৌখিক চরমপত্র দিয়ে যায়।

নলডাঙার সব চেয়ে বড় বিপদ কিন্তু এ নয়। জোর করে মাথা গুঁজবার একটা ব্যবস্থা তো হল আপাতত, কিন্তু এর পরে তারা খাবে কী? দু এক জন ছাড়া আর সকলেরই পুঁজিপাটা প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছে। কারো দু'দিন আগে ফুরোবে, কারো বা দু'দিন পরে, এই যা তফাৎ। কেউ রাস্তায় দাঁড়িয়ে সস্তা আমেরিকান ঝিরুণী-লজেন্স বিক্রি করে; কেউ ঘরে তৈরী পান বা চানাচুর ফেরি করে বেড়ায়; মেয়েরা ঘরে বসে ঠোঙা তৈরী করে অসংখ্য—গুল আর ঘুঁটে দেয় অপর্য্যাপ্ত। তবু রাজধানীর চড়া বাজারের সঙ্গে তারা পাল্লা দিয়ে উঠতে পারে না। দু-একজন এরিমধ্যে এক বেলা করে খেতে আরম্ভ করেছে। কলকাতার কাছাকাছি গতরে খাটার কাজ পেয়ে চলে গেল কেউ কেউ। কেউ বা অপরিচিত লোকের আশ্বাসের উপর ভরসা করেই সপরিবার মেদিনীপুর বা বীরভূম যাত্রা করল। নলডাঙা ভেঙ্গে টুকরো হয়ে গেল। শেষ পর্য্যন্ত ঐ বাড়ীতে রয়ে গেল শুধু বিশু চক্কোত্তি, প্রসন্ন, মঙ্গলা আর আসন্নপ্রসবা বাতাসী।

ওদিকে শ্রীকান্ত জেল থেকে বার হয়ে গ্রামে ফিরে দেখে, তার বাস্তুভিটায় কেউ নেই—গোটা হিন্দুপাড়াটা খাঁ-খাঁ করে—চারদিকে যেন শ্মশানের স্তব্ধতা! সেদিনই সে রওয়ানা হল কলকাতায়। তার আসন্নপ্রসবা স্ত্রী কোথায় কী ভাবে আছে তা না জানা পর্য্যন্ত সে সুস্থির হতে পারছে না।

কলকাতায় পৌছেই শ্রীকান্ত নলডাঙার দলের সন্ধান করতে থাকে। রাতদিন তার আর কোনো চিন্তা নেই। লেক ক্যাম্প, হাওড়া ক্যাম্প, আন্দুল ক্যাম্প—কলকাতার আশপাশের কোনো আশ্রয়প্রার্থী শিবিরেই খোঁজ নিতে বাকী রাখে নি শ্রীকান্ত। কিন্তু কোথাও তারা নেই।

অবশেষে বহুকষ্টে শ্রীকান্ত তাদের সন্ধান পেল। বাতাসী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করেছে। কিন্তু তার অবস্থা তখন শঙ্কাজনক। ডাক্তার জানিয়েছে জীবনের আশা কম। স্বামীকে দেখে বাতাসী উল্লাসে উদ্বেল হয়ে কাঁদতে থাকে—দুর্ব্বল কণ্ঠে কেবলি জানায় আবার দেশে ফিরে যাবার ইচ্ছা, আবার ঘর বাঁধবার সুখস্বপ্নের কথা। শ্রীকান্ত বাতাসীকে সান্ত্বনা দিচ্ছে এমন সময় বাইরে উত্তেজিত কোলাহল। শ্রীকান্ত ছুটে বার হয়ে এসে দেখে নীচে সিঁড়ির মুখে বাড়ীওয়ালার লোকজন ও বাস্তহারাদের মধ্যে মারামারি সুরু হবার উপক্রম। শ্রীকান্ত উত্তেজনায় ফেটে পড়ে। তাকে এবং আর সকলকে বিশু চক্কোত্তি বহু কষ্টে থামালেন। অপর পক্ষকেও আপাতত তিনি নিরস্ত করলেন এই সর্ত্তে যে, আর এক সপ্তাহের মধ্যে তারা ঐ বাড়ী ছেড়ে যেখানে হক চলে যাবে।

বাড়ীওয়ালার লোকজন সরে পড়ার আগেই দোতলা থেকে ভেসে এল মঙ্গলার বুকফাটা ক্রন্দনধ্বনি। সকলে উর্দ্ধশ্বাসে উপরে ছুটে গেল। শ্রীকান্ত, প্রসন্ন ও বিশু চক্কোত্তি ঘরে ঢুকে নিশ্চল পাষাণ মূর্ত্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল বহুক্ষণ। বাতাসী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে। সেই মর্ম্মান্তিক নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে নবজাত শিশু এক-বার কেঁদে উঠল। শ্রীকান্তর কাতর দৃষ্টি মৃত পত্নীর দিক থেকে ফিরে গেল সন্তানের দিকে। বিমূঢ়ের মতো আস্তে আস্তে কাছে যায়—সন্তর্পণে কোলে তুলে নেয় তার ভবিষ্যৎ ভরসাকে।

———

বাস্তহারা জীবনের আলেখ্য

"ছিন্নমূল"

দেসা পিকচার্সের প্রথম ছবি

——০:০:০——

বিভিন্ন বিভাগে

প্রযোজনা	:	শ্যামল দে
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা	:	নিমাই ঘোষ
কাহিনী ও সংলাপ	:	স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য
সুর	:	কালোবরণ
চিত্র-শিল্পী	:	বিশ্বনাথ গাংগুলী
সম্পাদনা	:	গোবর্দ্ধন অধিকারী
রসায়নাগারিক	:	ধীরেন দে, (কে, বি)
প্রধান শব্দযন্ত্রী	:	নৃপেন পাল
শব্দযন্ত্রী	:	ইন্দু অধিকারী
ব্যবস্থাপনায়	:	প্রীতি মজুমদার
শিল্প নির্দ্দেশক	:	অনিল পাইন কবি

: ছবির ভূমিকায় :

শোভা সেন, শান্তাদেবী, শান্তি মিত্র, প্রেমতোষ রায়, গঙ্গাপদ বসু, সুশীল সেন, বিজন ভট্টাচার্য্য, সুনীল রায় চৌধুরী, সুনীল ভৌমিক এবং আরও অনেকে।

সহকারীগণ

পরিচালনা	:	প্রদ্যুৎ দত্ত, নুটু মজুমদার
সুর	:	গোপাল গোস্বামী
চিত্রশিল্পী	:	নবেন্দু পাল
সম্পাদনা	:	শেখর চন্দ
শব্দযন্ত্রী	:	মানস

— রাধা ফিল্ম ষ্টুডিওতে ছবি তোলা হয়েছে —

একমাত্র পরিবেশক :—

ইউনিয়ন ডিষ্ট্রীবিউটার্স

১৬।১৭, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

দেশের
চিত্র
যাদের রক্তক্ষয়ী
পরিশ্রমে
ইস্পাত - সভ্যতা
গড়ে উঠেছে,
তাদেরই সুখ,
দুঃখের ছবি
এই—
ইস্পাত